বিহঙ্গপ্রবণ

কাজী জহিরুল ইসলাম

নয়

নাজিমুদ্দিন রোডের এসফল্টের ওপর তেছড়া হয়ে সকালের রোদ এসে পড়েছে । এরপরই একখন্ড ফেরারি মেঘ এসে সূর্যকে ঢেকে দেয় । জেলগেইটে কয়েকটি গাড়ি থামে । একদল ভূতুড়ে বাদুড়ের কালো ডানায় ঢাকা পড়ে পুরোনো ঢাকার এই রাস্তাটি । ৩০ জন ব্যারিস্টারের কালো কোট । জেলগেইট থেকে খানিকটা দূরে, কাউলার দোকান থেকে একশলা ক্যাপস্ট্যান সিগারেট কেনে বাতেন । আরেকটু দূরে দুটি শিশু, রাস্তার ওপর জমে থাকা সকালের তাজা ময়লার স্তুপ ঘাটছে । পাশেই একটি কুকুর, প্রিয় কোন খাবারের স্বাদ পেয়ে আনন্দে লেজ নাড়ে । দোকানের সাইড ওয়ালে ঝোলানো পাটের রশি থেকে সিগারেটে অগ্নি-সংযোগ করে বাতেন । জ্বলন্ত রশির আগুনে দেয়ালের চুন পুড়ে রশির সমান্তরাল কালো একটি রেখা তৈরী হয়েছে । সেই রেখা থেকে চোখ ফেরায় বাতেন, যখন লোহার জায়েন্ট জেলগেইটটি দড়াম করে বন্ধ হয় । এরপর ক্যাচ ক্যাচ....ঘটাং করে ভেতর থেকে আংটা লাগানোর শব্দ হয় ।

আজ ২৮ জুন, ১৯৭৬ । বাতেনের চোখে বিস্ময় । ‘আজিব বিছয়, ইতনি সারি কালা কোট কেলা আইছে ? অগো ভি অ্যারেস্ট করছে ? ওই কাউলা, জানছ কিছু ?’ কাউলা এদিক-ওদিক মাথা নাড়ে । মুখে কিছুই বলে না । বাতেন নড়ে না ওখান থেকে । কিছু একটা দেখার আশায় বন্ধ হয়ে যাওয়া লোহার গেইটের দিকে তাকিয়ে থাকে । পান-সিগারেট কিনতে এসে একে একে আরো কয়েকজন দোকানটির সামনে দাঁড়ায় । দোকানের কপালে ঝোলানো চম্পা কলার কাদি থেকে বাতেন নিজের হাতেই দুটো কলা ছিঁড়ে নিয়ে টুলের ওপর বসে পড়ে । ‘ওই কাউলা, পানি দে হৌড়ের পো ।’ ‘গাইল পারেন ক্যা? পানি চাইছেন, দিতাছি । এইটা কিমুন তরিকা, আগে সিরকেট, পরে কেলা ?’ সামনে অনেক কাস্টমার । কাউলা ব্যস্ত অন্য একজনের হাতে ডাবল খিলি পান তুলে দিতে । চম্পাকলা দুটো শেষ করে এল্যুমুনিয়ামের গ্লাস থেকে পানি মুখে দিয়েই, ওয়াক থু, কুলি করে দেয় বাতেন । ‘ওই মামদার পো, এইটা পানি ? এই রহম গেরান ক্যা ?’ কাউলাও কম যায় না । ‘মাগনা পানি । সরবতের গেরান আইবো নিহি ?’ এসব কথাকাটাকাটির মধ্য দিয়েও ওদের মধ্যে একটা নিবিড় বন্ধুত্ব তৈরী হয় এবং তা টিকে থাকে বছরের পর বছর ধরে ।

এরি মধ্যে আরো কিছু লোক এসে জড়ো হয় । কাউলা ভয় পেয়ে যায় । সবাইকে চলে যেতে বললেও কেউ যায় না । কিছু একটা দেখার অপেক্ষায় সবাই ভিড় করতে থাকে । কাউলার মেজাজ খিচে যায় । ‘মিয়া সাবরা সদায়-অদায় ল’য়া লৌড় দেন ক’লাম । ভিড় বাড়ায়েন না । আমারে ভি হান্দাইবার চান ? যান যান কাইটা পড়েন ।’

আমরা সবাই জানি সেদিন কি হচ্ছিল ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে । অবসরপ্রাপ্ত কর্ণেল আবু তাহেরের বিচারকার্য চলছিল । নাটকের পান্ডুলিপি চুড়ান্ত হয়ে গেছে । এখন দৃশ্যায়ন চলছে । প্রধান প্রসিকিউটর এটিএম আফজাল, এই বিশেষ ট্রাইবুন্যালের চেয়ারম্যান কর্ণেল ইউসুফ হায়দার । ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের বিশাল হলুদ দেয়ালের অভ্যন্তরে আজ বন্দী কানুন, আইন, মানুষের অধিকার । এই প্রথম বিচারকার্য কারাবন্দী হলো । সেই কারাবন্দী বিচারের কথা কাউকে বলা যাবে না, কাউকে জানানো যাবে না । সংবাদ, মানুষের বাক স্বাধীনতা, কারাবন্দী হলো । ভীতিকর নিরাপত্তা সর্বত্র । প্রতিটি এন্ট্রি-এক্সিটের মুখেই স্তুপিকৃত বালুর বস্তা, ফাকে বন্দুকের নল । হায়রে বালির বাঁধ ।

ট্রাইবুন্যালের মুখোমুখি হতে অস্বীকৃতি জানান কর্ণেল তাহের, ‘বিচারের নামে প্রহসন’ । ইউসুফ হায়দারকে ইঙ্গিত করে বলেন, একজন অমুক্তিযোদ্ধা তার বিচার করতে পারে না । তাহের দাবী জানালেন মুক্তিযুদ্ধ করেছে এমন অফিসারদের সমন্বয়ে বেঞ্চ গঠনের জন্য । তার দাবী অগ্রাহ্য হলো । ১৭ জুলাই ট্রাইবুন্যালের চেয়ারম্যান ইউসুফ হায়দার কর্ণেল আবু তাহেরের মৃত্যুদন্ড ঘোষণা করেন । পুরো মাস জুড়ে এই বিচারকার্যের খবর বাংলাদেশের কোন কাগজ ছাপে নি । শুধুমাত্র দৈনিক ইত্তেফাক পেছনের পাতায় এক কলামের একটি ছোট্ট নিউজ করায় ইত্তেফাকের সম্পাদক আনোয়ার হোসেন মঞ্জুকে সেনানিবাসে ডেকে নিয়ে অ্যারেস্ট করার হুমকি দেওয়া হয় । মৃত্যুদন্ডের বিরুদ্ধে তাহের যদিও আপিল করতে চান নি কিন্তু তার আইনজীবীদ্বয়, আতাউর রহমান এবং জুলমত আলী, প্রেসিডেন্ট এ, এস, এম, সায়েমের কাছে আপিল করেন । প্রেসিডেন্ট সায়েম মাত্র ২৪ ঘন্টার মধ্যে আপিল নাকচ করে দিয়ে মৃত্যুদন্ড বহাল রাখেন ।

যিনি খালেদ মুশাররফ গংদের হাত থেকে জিয়াউর রহমানকে মুক্ত করে এনে ক্ষমতায় পূনঃবহাল করেন সেই তাহেরকে কেন জিয়াউর রহমান এ রকম একটি পরিস্থিতিতে ফেললেন এই রহস্য চিরকাল আমার কাছে রহস্য হয়েই রইলো । এই বিষয়ে পরে অবশ্য বাংলাদেশ সেনাবহিনীর বিভিন্ন পদে কর্মরত অফিসারদের সাথে কথা বলে জেনেছি, মূলত কর্ণেল তাহের জেনারেল জিয়াকে সেনানিবাস থেকে উদ্ধার করতে ঢাকায় আসেন নি, এসেছিলেন অন্য এক জিয়াকে উদ্ধারের জন্য । কমান্ড বুঝতে পারে নি জোয়ানরা, এই জিয়াকে মুক্ত করে নিয়ে আসে । যেভাবেই ঘটনাটি ঘটুক না কেন, প্রেসিডেন্ট জিয়া সেদিন বেঁচে বেরিয়ে এসেছিলেন তাহেরের জন্যই । কাজেই প্রাণরক্ষাকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন না করে তারই প্রাণ হন্তারকের ভূমিকায় দেশপ্রেমিক জিয়াউর রহমানকে কল্পণা করতে আমার কখনোই ভালো লাগে না ।

ঠিক সেই সময়টাতেই, একদিন খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে গোলাপবাগ মাঠে চলে যাই । দেখি বেশ কিছু নারী-পুরুষ হাঁটতে হাঁটতে কোনাকুনি মাঠ পেরিয়ে কোথায় যেন যাচ্ছে । আমিও সেই কাফেলায় শরীক হয়ে যাই । এসে পৌছাই ধলপুরের ময়লার ডিপোতে । দেখি ক্যামোফ্লেইজ পরা এক সামরিক অফিসারের মৃতদেহ পড়ে আছে । তার বাঁ হাতে বড় ডায়ালের একটি ঘড়ি, হাতের অনামিকায় মেরুন রঙের পাথর বসানো সোনার আংটি, প্যান্টের পকেট থেকে অর্ধেক বের হয়ে আছে একতাড়া এক’শ টাকার চকচকে নতুন নোট । বুকের একটি বুতাম খোলা, ভেতরে শাদা স্যান্ডো গেঞ্জি রক্তে মাখানো । চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা কে এই হতভাগা সামরিক কর্মকর্তা ? শোল্ডারে কোন র‍্যাঙ্ক নেই। বোধ হয় লাশটা যারা ফেলে দিয়ে গেছে অথবা যারা তাকে হত্যা করেছে তারাই র‍্যাঙ্কের মেটালগুলো খুলে নিয়েছে অথবা এ-ও হতে পারে র‍্যাঙ্ক খুলে নিয়ে তারপরই তাকে হত্যা করা হয়েছে । মৃতদেহটি ঘিরে চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকা নারী-পুরুষ নানান রকম মন্তব্য করছিলো বটে, কোন এক নারী, আহারে কার পুত না

জানি, ধরণের মন্তব্যে খানিকটা দুঃখ প্রকাশ করছিল যদিও কিন্তু মোটের ওপর মানুষের চোখে-মুখে তেমন কোন শোকের চিহ্ন নেই । মানুষের কি মায়া-মমতা উঠে গেল ? নাকি এইসব বেওয়ারিশ সামরিক লাশের প্রতি দুঃখ প্রকাশে কোন নিষেধাজ্ঞা ছিল ? এলে-বেলে ধরণের হাঁটা হাঁটতে হাঁটতে কোথায় কোথায় চলে যাই । এক সময় পেটের ভেতর ক্ষিধা মোচড় দিয়ে উঠলে বাসায় ফিরে আসি । আম্মা গরম গরম পরোটা বানিয়ে বসে আছেন । আব্বা জিজ্ঞেস করেন,

কই গেছিলা ?
একটা লাশ দেখতে ।
লাশ কই দেখলা ?
ধলপুরের ডিপোতে ।
আর কে গেছিলো ?
অনেক লোক ।
পাবলিক ?
না, মানুষ ।
আব্বা তখন হাসেন ।
কেমন মানুষ, পাবলিক ?
আমি বলি, না পাবলিক না, মানুষ ।
মানুষগুলি কি পুলিশ ?
না, পুলিশ না ।
মানুষগুলিরে তুমি চিনো ?
না, চিনি না । অচেনা মানুষ ।
অচেনা মানুষের লগে গেলা কেন ? আর যাইবা না ।
ঠিক আছে আর যাবো না ।
ভয় পাইছো ?
হুঁম । আমি ওপর-নিচ মাথা নাড়ি ।

আব্বা আমাকে কাছে টানেন । আদর করেন । তখন আমি কেঁদে ফেলি । বুকের ভেতর জমে থাকা ভয়টা যেন এতোক্ষণ ডিপফ্রিজে রাখা বরফ হয়ে ছিল । আব্বার স্নেহের স্পর্শে তা গলে জল হয়ে গেল । সেই জলে এখন আমার চোখ ভেসে যাচ্ছে ।

৭৬ সালে এমনি অনেক মানুষের মৃতদেহ এখানে-সেখানে পড়ে থাকতে দেখা গেছে । মুক্তিযোদ্ধা-অমুক্তিযোদ্ধা, হিন্দু-মুসলমান, রাজনৈতিক বৈরীতা, সর্বোপরি ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক শত্রুতামূলক কলহের নীরব প্রতিশোধ চলতো গোপনে গোপনে । সেনানিবাসের হত্যাকান্ড তার সাথে এক বাড়তি মাত্রা যোগ করে ।

আগে বছরে ২/৩ বার গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে গেলেও এ বছর একবারও যাওয়া হয়নি । বেড়াতে যাওয়ার আগে আব্বা সব সময় আমাদের নতুন জামা-কাপড় কিনে দেন । সেগুলো বন্ধুদের দেখিয়ে বলি, আমরা দেশে যাবো । এ বছর একবারও বলা হয় নি, দেশে যাই । আমার আম্মা সবসময় মনে করতেন, ঢাকায় আমাদের যে সংসার, এখানে তিনি বেড়াতে এসেছেন । তার আসল ঠিকানা হলো খাগাতুয়া । খাগাতুয়ায় যাওয়ার জন্য তিনি সারাক্ষণ আকুলি-বিকুলি করতেন । এখন হয়ত তিনি বুঝতে

পেরেছেন এই টিনশেডের ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভাড়া বাড়িটাই তার আসল ঠিকানা। এখানেই তাকে শেকড় ছাড়তে হবে। তিনি শেকড় ছেড়েছেন। সেই শেকড় মাটির অনেক গভীরে ঢুকে গেছে। তাই এ বছর এখনো আমাদের খাগাতুয়ায় যাওয়া হলো না। বার্ষিক পরীক্ষার পরে সিদ্ধান্ত হলো কনক-রিপনকে সাথে নিয়ে আমি খাগাতুয়ায় যাবো। হুশেন মামা আমাদের দিয়ে আসবেন। প্রথমে যেতে হবে ডেমরা। ওখান থেকে নৌকায় চড়ে শীতলক্ষা পেরিয়ে তারাবো। তারাবো থেকে বাসে নরসিংদী। নরসিংদী থেকে দুই ঘন্টার লঞ্চভ্রমণ। করিমপুর, মরিচা, সলিমগঞ্জ, বড়িকান্দি পার হয়ে মানিকনগর ঘাট। এরপর সাড়ে তিন মাইলের পায়ে হাঁটা পথ। সেই পথ শ্যামগ্রামের শত বছরের পুরোনো মন্দির, শ্যাওলা পড়া জমিদার বাড়ি, থ্যাতলানো শানবাঁধানো ঘাটের সবুজ পুকুর, যোগীর আশ্রম, আঙিনার মুলাক্ষেত, তিষি-সয়াবিনের বাগান, এরপর দীর্ঘশাইর-এর দিগন্ত বিস্তৃত হলুদ সরিষার চক পেরিয়ে ঝাকরা মাথাঅলা সুবিশাল বটবৃক্ষের ছায়া মাড়িয়ে খাগাতুয়া গ্রাম।

সারাদিনের পথ। আমরা নাস্তা খেয়ে বেরিয়ে পড়ি। গুলিস্তান থেকে ডেমরা যাওয়ার দুটি উপায় আছে। বাস এবং বেবীট্যাক্সি। বাসে উঠলেই আমার মাথা ঘোরে, বমি হয়। মামাকে আমি সব সময় পীড়াপীড়ি করি বেবীট্যাক্সি নেওয়ার জন্য। মামা পয়সা বাঁচানোর জন্য কখনোই বেবী নিতে চান না। আমি অঙ্ক করে মামাকে বুঝিয়ে দিই এবার আমরা চারজন, বেবী নিলে বরং খরচ কমই পড়বে। তবু তিনি রাজী হতে চান না। তখন বাচ্চাদের জন্য বাসে হাফ ভাড়ার প্রবর্তন ছিল। এজন্য বাস কন্ডাক্টরের সাথে বেশ খিটিমিটি করতে হতো। সেই অর্ধেক ভাড়ায় যেটুকু বাঁচবে, ওটাই মামার লাভ। শেষমেষ অবশ্য তিনি রাজী হলেন। আমরা বেবীতে চড়ে ডেমরা এসে পৌঁছলাম।

সারি সারি উদলা নৌকা শীতলক্ষায় ভাসছে। ডেমরা গুদারাঘাট থেকে আমরা ডিঙ্গি নৌকায় চড়ি। নৌকার মাঝখানে একটি চৌকি পাতা, চৌকির চারপাশে গোল হয়ে বসেছে যাত্রীরা। শীতলক্ষার ঢেউয়ে নৌকা দুলছে, আমরা এগিয়ে চলেছি তারাবোর দিকে। অনেকগুলো ইন্ডাস্ট্রির চিমনি থেকে ধোয়া উঠছে, কোন এক জুটমিলের ছাদের ওপর কয়েকটি কাঠের বান্দর বোঁ বোঁ করে ঘুরছে। শীতলক্ষার বুকে দুলতে দুলতে এইসব অতিচেনা দৃশ্য দেখছি। এই দৃশ্যগুলো দেখলেই আমার হৃদয়ে এক শীতল আনন্দানুভূতির স্পর্শ লাগে। খাগাতুয়ার মমতাময় হাতছানি আমার মধ্যে এক অপার্থিব ঘোর তৈরী করে। ঘোরটা আরো সুদৃঢ় হয় যখন নৌকা থেকে নেমেই দেখি একটি মুড়ির টিন টাইপের বাস দাঁড়িয়ে আছে ঘাটের অদূরে। হেলপার নশুন্দি নশুন্দি বলে গলা ফাটাচ্ছে। বাসের ভেতরে তখন প্রাণের স্পন্দন, ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার আঞ্চলিক কথোপকথন।

আলু কি দরও মজলুর বাফ ?
গত আডো ফুনে সাত গেছে বাইসাব।
বাড়বোনি চালাইয়া ?
বাজারডা থম ধৈরা রৈছে। কওন যায় না কিছু।
কি লৈয়া আইছলা তুমি ?
বাইসাব, গরু লৈয়া আইছলাম।
দর ভালাঐ ফাইছোনি ?
ফাইছি মাশাল্লা।
বেচছো কই ?
নশুন্দি। বেফারিরে দেলাইছি। ডাহা গেছলাম মাইয়াডারে দেখতামবৈল্লা।
তুমারদো আবার নাতি ঐছে।

হ হুড়ন বাইসাব । নাতি ঐছে আজগা আষ্টোদিন ।
নাতির মুখ দেখলা কি দিয়া ?
নশুন্দি বাইন্যার গরেত্যেন একটা সোনার আংটি নিছলাম । মাইয়াডা জবর খুশি ঐছে ।
পৈলা পরথম নানা ঐলা নিও মজলুর বাফ ?
সামনের আসন থেকে প্রশ্ন করে অন্য একজন । যার পরণের পাঞ্জাবীটা বেশ পরিস্কার । পায়ে রাবারের স্যান্ডেল ।
জ্বিঅ মিয়াসাব ।
বেশ আদপের সাথে জবাব দেয় মজলুর বাপ ।

এইসব কথোপকথোন শুনে কনক-রিপন বা হুশেন মামার মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া হয় কি-না জানি না কিন্তু আমার প্রাণ জুড়িয়ে যায় । এর চেয়ে মধুর ভাষা কি পৃথিবীর আর কোথাও আছে ? আমার মনে হয় ময়লা পাঞ্জাবী-লুঙ্গি পরা, খালি পায়ে, উস্কো-খুস্কো চুলের এই মানুষগুলোই আমার সবচেয়ে আপনজন । এদের কারো বাড়ি মাঝিআরা, কারো বাড়ি দড়িকান্দি, কারো বাড়ি শ্যামগ্রাম, কারো বাড়ি শ্রীঘর, হয়তবা কারো বাড়ি খাগাতুয়া । কিন্তু আমার মনে হয় ওদের সকলের বাড়ি আমার বুকের ভেতর । আমার চোখের সামনে ভাসতে থাকে খাগাতুয়ার বাঁশঝাড়, সবচেয়ে উঁচু বাঁশটির মাথায় বসে একটি লাউয়া ঘুঘু অবিরাম ঘু ঘু-উ-উ ঘু ছন্দে ওর সঙ্গিনীকে ডাকছে । চাতলায় গাবানি উঠেছে । মেজো মামার হাত ধরে পলো নিয়ে আমরা ছুটছি বড় বড় একেকটা শোল-বোয়াল মাছ ধরতে । নানী আমাকে দেখে ঘাটের কাছে ছুটে এসে বলছেন, ‘আমার বাই আইছেনি, আইয়ো বাই আইয়ো। যাও ত্বরায়া উজু কৈরা আইয়ো । নানী তোমার লাগি কনকতারা চাইলের গরম গরম ভাত বাড়ি মুরগার সান দিয়া ।’

বাসের জানালায় চোখ রেখে দেখি অতি দ্রুত বাঁশঝাড়, আম-জাম-কাঠালের বন, কচুরীপানা ভর্তি ডোবা, সরিষার হলুদ চক, গমের সবুজ ঢেউ আর তার পেছনে নীল আকাশ ঝড়ের গতিতে উড়ে চলে যাচ্ছে । মাধবদী এসে যখন বাস থামে তখন একদল লোক তড়িঘড়ি করে নানান রঙের কাপড়ের গাঁট তোলে বাসের ছাদে । বাইরে, রাস্তার পাশে ডাই করার কারখানা । লাল, নীল, হলুদ, কমলা, সবুজ নানান রঙ করা থান কাপড়ের সারি, রোদে শুকোতে দেওয়া হয়েছে । পথের পাশের এই রঙিন দৃশ্যটি দেখেই চিনে নিতাম আমরা এখন মাধবদী, আর মাত্র ৪৫ মিনিট, এরপরই পৌছে যাবো নরসিংদী ।

পাঁচদুনা থেকে সোজা রাস্তাটি চলে গেছে ঘোড়াশালের দিকে, ডানে বাঁক নিলেই নরসিংদী । নরসিংদী বাসস্ট্যান্ড থেকে রিক্সা নিতে হয় । ঘাটের রিক্সাওয়ালাদের গায়ে অশুরের শক্তি । ওরা রিক্সা চালায় ঝড়ের গতিতে । লঞ্চঘাট, লঞ্চঘাট ডাকতে থাকে, যাত্রী নিয়েই এক ছুট । উদ্দেশ্য, ফিরে এসে আরো একটি ক্ষেপ ধরা । লঞ্চঘাটে বেশ কয়েকটি মিষ্টির দোকান । আমরা ওখানে বসে মিষ্টি খাই, জিলিপি খাই । হুশেন মামার সাথে গেলে কিছুটা ফকিরা হালে খাওয়া-দাওয়া করতে হয় । সাথে আব্বা থাকলে নিজেকে রাজা-বাদশাহর মতো লাগে । তখন যা চাই, তা-ই পেয়ে যাই । আব্বা কোনকিছুতেই না করেন না ।

মিষ্টির দোকানে খাগাতুয়ার কারো না কারো সাথে দেখা হবেই । তখন তীর্থ আরো নিকটবর্তী হয়ে আসে । মেঘনার ঘোলা জলের দিকে তাকিয়ে সব সময়ই আমার বুক কেঁপে ওঠে । এই কম্পন ভয়ের না, আনন্দের । এই মেঘনা আমার কতো প্রিয় । এর প্রতিটি ঢেউ আমি চিনি । মেঘনার নিচে যেসব মাছ ছুটোছুটি করছে আমি ওদেরও চিনি, জলের নিচে ভেসে যাওয়া শ্যাওলাদেরও আমি চিনি । ওরা সবাই

আমার আত্মীয় । যখন দেখি জেলেরা ঘাটে নৌকা ভিড়ায়, মাছ বেঁচে দিয়ে খালুই উল্টো করে ঘাটের ওপর ঝেড়ে দেয়, তখন খালুইয়ের নিচে লেগে থাকা একটা কাঁকড়া মাটিতে পড়ে কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়ায়, কনক অথবা রিপন ছুটে যায় সেই কাঁকড়াটিকে পদপিষ্ট করে মারার জন্য । আমি বাঁধা দিই, পথ আগলে দাঁড়াই, চিৎকার করে উঠি, খবরদার মারবে না ওকে । কারণ এই কাঁকড়াটির বাড়ি মেঘনা নদীতে । মেঘনাকে তখন মনে হয় আমার মা, আর কাঁকড়াটি আমার ভাই । খবরদার আমার ভাইকে কেউ ছোবে না ।